Vol. 29 | No. 3 | 1986

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জীবনানন্দ-কাব্যে অস্তিত্ববাদ প্রসঙ্গ

Volume	29
Issue	3
Year	1986
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	গালিব আহসান খান
Published online	June 1, 1986
DOI	10.62328/sp.v29i3.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v29i3.4
Pages	115-129
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

জীবনানন্দ-কাব্যে অস্তিত্বব[illegible]

Check for updates

গালিব আহ্সান খান

অস্তিত্ববাদকে আমরা দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে পারি। একদিকে পাই বিশুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব ; অন্যদিকে পাই মৌল জীবনবোধ। মৌল জীবনবোধের দিক থেকে সার্ত প্রধানত একজন শিল্পী ও সাহিত্যিক; বিশুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে তিনি মূলত একজন তাত্ত্বিক ও দার্শনিক; এভাবে দেখলে হাইডেগার ও হুজার্ল্ হলেন মূলত অস্তিত্ব-বাদী দার্শনিক, শিল্পী বা সাহিত্যিক নন। অন্যদিকে ক্যামু প্রধানত অস্তিত্ববাদী সাহিত্যিক। এ-বিবেচনা অনুসারে জীবনানন্দ দাশকেও (১৮৯৯-১৯৫৪) আমরা অস্তিত্ববাদী জীবনচেতনায় পরিস্রুত একজন কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

অস্তিত্ববাদের ইতিহাসে আমরা যে-কজন বিশিষ্ট দার্শনিককে পেয়ে থাকি, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন সার্ত। অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে সার্তের দার্শনিক আলোচনা আমরা মূলত পাই তাঁর দুটো গ্রন্থে : *Being and Nothingness* এবং *Existentialism and Humanism*। প্রথমটিতে প্রাধান্য পেয়েছে বিশুদ্ধ তত্ত্ব ; দ্বিতীয়টিতে উপস্থাপিত হয়েছে মানবতাবাদের প্রেক্ষাপটে প্রদত্ত অস্তিত্ববাদী জীবনচেতনার বিশ্লেষণ। নিম্নোক্ত আলোচনায়, এ-কারণে, দ্বিতীয় গ্রন্থটিকে অনুসরণ করাই সঙ্গত এবং বাঞ্ছনীয়।

অস্তিত্ববাদকে আমরা দু'ধারায় চিহ্নিত করতে পারি—যেমন, আস্তিক ও নাস্তিক। সার্ত এই দ্বিতীয় ধারার নাস্তিক্য দর্শনকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু নাস্তিকতাকে যদি আমরা গ্রহণ করি, অর্থাৎ কোন ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তাকে আমরা যদি স্বীকার না করি, তাহলে মানুষের জীবন একটা বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করবে। মানুষ অন্য কোন সত্তা দ্বারা সৃষ্ট নয়, পূর্ব-কল্পিত বা পূর্ব-নির্ধারিতও নয়। মানুষের অস্তিত্ব তাই প্রথমে

আসবে, এবং অস্তিত্বশীল মানুষের কর্মকাণ্ড দিয়েই পরবর্তীতে নির্ধারিত হবে তার সারসত্তা (essence)। সার্তের কথায়, 'অস্তিত্ব সত্তার পূর্বগামী'।[১]

এই নাস্তিক পরিমণ্ডলে যেমন কোন বিধি নেই, তেমনি কোন (বিধির) বিধানও নেই, পরকালে পুরস্কারের কোন প্রতিশ্রুতি নেই, সেই অর্থে কোন আশাও নেই। পূর্ব-নির্ধারিত কোন নিশ্চয়তাও (determinism) নেই। আছে মানুষ নিজে, আছে বিধান-বিহীন অবস্থায় স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ (freedom), আছে বিচিত্র সম্ভাবনা ও বিকল্পের মাঝ থেকে স্ব-নির্বাচনের সুযোগ (choice), এবং আছে এ-বিচিত্র পটভূমিতে আত্ম-নির্মাণের ভিতর দিয়ে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে উপনীত হবার সম্ভাবনা। এমনি অবস্থায় মানুষ আত্ম-নির্মাণের ভিতর দিয়ে নিজেকে কোন পর্যায়ে উপনীত করতে পারে সেটাই হলো মূল বিবেচ্য বিষয়। এবং এ-ক্ষেত্রে একজন মানুষের প্রতিটি কাজের পূর্ণ দায়িত্ব (responsibility) অর্পিত হবে শুধু তার নিজেরই ওপর। মানুষের জীবনের এই অবস্থাকে সার্ত বলেছেন পরিত্যক্ততার অবস্থা : the state of abandonment।[২]

পরিত্যক্ত এই অবস্থায় একজন মানুষ তার কর্মকাণ্ড এবং এর প্রগাঢ় দায়িত্ববোধ থেকে স্বভাবতই উৎকণ্ঠা (anxiety) বোধ করবে; এবং আসতে পারে তার হতাশা (despair), ভয় ও মনস্তাপ (anguish)। একজন অস্তিত্ববাদীর জীবনবোধের এই লক্ষণগুলো হলো বিবেচনার মৌলিক বিষয়।

আমরা ওপরে লক্ষ্য করেছি যে, একজন মানুষের জন্যে থাকবে আত্ম-নির্মাণের ভিতর দিয়ে তার নিজস্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উপনীত হবার সম্ভাবনা। এমনি অবস্থায় মানুষ নিজেকে যেমনভাবে তৈরী করবে, সেটাই হবে তার প্রকৃত রূপ। সার্তের ভাষায় : Man is... which he makes of himself।[৩] ব্যক্তির এই আত্ম-নির্মিত বৈশিষ্ট্যকে আমরা তার আত্ম-ব্যক্তিকতা (subjectivity) বলতে পারি।[৪] অন্যদিকে একজন মানুষের আত্ম-নির্মাণের পটভূমিতে থাকবে অন্য আরো মানুষ, এবং তাদেরও আত্ম-নির্মাণের ধারা। এবং এই ধারায় একজন মানুষ

স্বতন্ত্র হতে পারে, কিন্তু তার অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়। এমনি অবস্থায় মানুষ বিভিন্ন সম্ভাবনা ও বিকল্পের ভিতর থেকে যখন কিছু নির্বাচন করবে তখন তার সেই নির্বাচন (choice) শুধু তার নিজের জন্যে নয়, বরং অন্য সকল মানুষের জন্যেও ভালো হতে হবে; যা সবার জন্যে ভালো নয়, তা নিজের জন্যেও ভালো হতে পারে না। এইভাবে মানুষ তার কাজের জন্যে যখন দায়ী হয়, তখন তার সে দায়িত্ব শুধু তার নিজের জন্য নয় বরং সকল মানুষের জন্যে। সার্ত বলেন:

> When we say that man is responsible for himself, we do not mean that he is responsible only for his own individuality, but that he is responsible for all men. ...When we say that man chooses himself, we do mean...that in choosing for himself he chooses for all men.[৫]

একইভাবে সার্ত আরো বলেন যে, In fashioning myself I fashion man।[৬] আর এভাবে মানুষ আত্ম-নির্মাণের ভিতর দিয়ে যে আত্ম-ব্যক্তিকতায় (subjectivity) উপনীত হয়, তা পরিণামে আসলে আন্ত-ব্যক্তিকতায় (inter-subjectivity) রূপ নেয়। আত্ম-নির্মাণের এ-ধারায় মানুষ যখন নিজেকে অতিক্রম করে উর্ধ্বে উত্তরণ (self-surpassing) লাভ করতে পারবে; এবং এভাবে যখন আত্ম-ব্যক্তিকতা গঠিত হবে, আত্ম-উত্তরণ দিয়ে তখন মানুষ উপনীত হবে মানবতাবাদে। সার্ত এই মানবতাবাদকে 'অস্তিত্ববাদী মানবতাবাদ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আত্ম-ব্যক্তিকতা থেকে আন্ত-ব্যক্তিকতার ভিতর দিয়ে আত্ম-উত্তরণই হলো অস্তিত্ববাদের শেষ কথা।[৭]

দুই

অস্তিত্ববাদের উপর্যুক্ত রূপরেখার পরিপ্রেক্ষিতে এ-সূত্র সুস্পষ্ট যে জীবনানন্দ দাশের কবিতার মৌল উৎসে সক্রিয় থেকেছে অস্তিত্ববাদী বোধ,

নিগূঢ় চৈতন্য। ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বকেন্দ্রিক জীবন-পরিক্রমা, তার ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও স্ব-নির্বাচিত সিদ্ধান্তসাধন এবং তদোৎসারিত দায়িত্বের ও দায়ী হবার বোধ, উৎকণ্ঠা, ভয় ও মনস্তাপ---এসবই জীবনানন্দ দাশের বহু কবিতার সুরকে ব্যঞ্জিত করেছে বহুলাংশে। এবং এসবেরও ঊর্ধ্বে রয়েছে ব্যক্তিমানুষের আত্ম-ব্যক্তিকতা থেকে আন্ত-ব্যক্তিকতায় উত্তরণের এবং অবশেষে আত্ম-উত্তরণের কথা। অস্তিত্ববাদী এই বোধকে আমরা চিহ্নিত করবো জীবনানন্দ-কাব্যের বিভিন্ন পর্বে—অবশ্য সূচনা-পর্বকে বাদ দিয়ে। “ঝরা পালক” (১৩৩৪) জীবনানন্দের সূচনা পর্ব, কিন্তু প্রকৃত জীবনানন্দ দাশ তখনও আত্ম-প্রকাশ করেননি। সুতরাং আলোচনার প্রথমে থাকবে “ধূসর পাণ্ডুলিপি” (১৯৩৬) এবং বিভিন্ন পর্ব থেকে কিছু নির্বাচিত কবিতা হবে এই পর্যালোচনার বিষয়।

“ধূসর পাণ্ডুলিপি”র বহু কবিতায় রয়েছে একটা ধূসর জীবনবোধ, যে-বোধ সম্পর্কে অস্তিত্ববাদীগণ নিয়তই উচ্চকণ্ঠ। জীবন সম্পর্কে অস্তিত্ববাদীগণ যে অনিশ্চয়তার কথা বলেন, জীবন পূর্ব-নির্ধারিত নয় বলে তাঁরা যে দাবী করেন, এবং অবশেষে মনস্তাপ ও হতাশার যে বোধের কথা তাঁরা বলেন, এ-সবই স্পষ্ট “ধূসর পাণ্ডুলিপি”-র নানা কবিতায়। প্রথম কবিতা ‘নির্জন স্বাক্ষর’-এর কথাই ধরা যাক: কবিতাটিকে মূলত প্রেমের কবিতা বলে মনে হয়। কিন্তু এরই পাশাপাশি রয়েছে একটা বিষণ্ণতা—এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিস্তৃত জীবনের বিবর্তনের অনুভূতি। জীবনতো শুধু প্রেম নয়, সেখানে আছে হেমন্তে ঝরে যাবার ব্যথা, মৃত নক্ষত্রের বুকের শীতস্পর্শ আমাদের শরীরে লাগার কথা। এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বর্তমান ব্যথিত-অতীতে পরিণত হবার বিষয়, এবং আমাদের হৃদয় ‘ক্লান্ত হ’য়ে শিশিরের মতো শব্দ ক’রে’ ঝরে যাবার গল্প। জীবনের এই ক্ষয়িষ্ণু চিত্রের মাঝে আছে একটা মনস্তাপ ও হতাশার অনুভূতি। এই অনুভূতি রূপ নেয় এক করুণ সুরে, যখন হতাশার মাঝেও জাগে এক গান; ‘তুমি তা জানো না কিছু---না জানিলে,/আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য ক’রে।[৮] সবকিছু ছাপিয়ে এ-বোধ মনে-হয় সেই পরিত্যক্ততারই বোধ।

‘নির্জন স্বাক্ষর’-এর মতো ‘সহজ’ কবিতাটির মাঝেও আছে একটা প্রচ্ছন্ন বোধ, যা সহজ নয়। অন্যদিকে অস্তিত্ববাদী জীবনবোধ স্পষ্ট

ও প্রবল হয়ে ছড়িয়ে আছে 'জীবন', '১৩৩৩', 'প্রেম' ও 'স্বপ্নের হাতে' কবিতাগুলোয়। এই সবগুলো কবিতায় সুরের এবং বোধের একটা ঐক্যও দেখা যায়; আমরা দেখতে পাই মনস্তাপ ও হতাশার যন্ত্রণা-কাতর এক চিত্র, পরিত্যক্ততার বোধের এক প্রকট প্রকাশ।

'জীবন' কবিতায় জীবন সম্পর্কে একটি প্রায় সম্পূর্ণ নেতিবাচক চিত্র এঁকেছেন কবি। জীবনের পটভূমি, এর চারণ-ক্ষেত্র এই পৃথিবী, আকাশ, নক্ষত্র ; এখানে আছে হেমন্তে ঝরে যাবার কথা, শীত রাতে আমাদের অস্থি কেঁপে ওঠার চিত্র, রাত্রি আর অন্ধকার, ক্লান্তি আর কবরের অনুভব। এই চারণ-ক্ষেত্রে 'হলদে পাতার মতো আমাদের পথে ওড়াউড়ি! / কবরের থেকে শুধু আকাঙ্ক্ষার ভূত লয়ে খেলা! / [এবং এরই মাঝে] আমরাও ছায়া হ'য়ে---ভূত হ'য়ে করি ঘোরাঘুরি!' এই নেতিবাচক পটভূমিতেও রয়েছে জীবনসক্রিয়তার স্বীকৃতি---যত ক্ষীণই হোক তার ধারা। আমরা সিদ্ধান্ত নেই, আমাদের স্বাধীনতা আছে, আর সেই সাথে আছে অনিশ্চয়তার উৎকণ্ঠা। এই সক্রিয়তা যদি নিয়ে আসে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতি, তাহলে মনস্তাপ ও হতাশা আসবে স্বভাবতই। 'জীবন' কবিতায় আমরা দেখি, আমরা সক্রিয় হয়ে উঠি ; কবির কথায় : 'অঙ্গারের মতো তেজ কাজ করে অন্তরের তলে, / যখন আকাঙ্ক্ষা এক বাতাসের মতো ব'য়ে আসে'। কিন্তু তবুও 'জীবন পুড়িয়া যায়;---'আমরাও ঝরে পুড়ে যাই'। থেকে যায় শুধু এক অনিশ্চয়তার উৎকণ্ঠা : 'হে ক্ষমতা,...তুমি আছো,---র'বে তুমি,---এর বেশী কোন নিশ্চয়তা তুমি এসে দিয়েছ কি?' এসব কিছু ছাপিয়ে জীবন সম্পর্কে এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করেন কবি : 'যক্ষ্মার রোগীর মতো ধুকে মরে মানুষের মন! / জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ।' আরো আছে : 'বাঁচিয়া থাকিতে যারা হিঁচড়ায়--করে প্রাণপণ,/এই নক্ষত্রের তলে একবার তারা যদি আসে, ...মৃত্যুরেও তবে হয়তো ফেলিবে বেসে ভালো'। মনস্তাপ আর হতাশার কী এক গভীর প্রকাশ!

'১৩৩৩' কবিতায়ও অনুরণিত হয় একই সুর। আমরা কখনো কোন বড় সিদ্ধান্ত নেই, আমরা দায়িত্বের চাপে দলিত হই। ছিঁড়ে-ফেঁড়ে যায় আমাদের জীবন ; আমাদের কাছে আসে অনেক সহজ আকর্ষণ, আমরা গ্রহণ করি না তা। সিদ্ধান্তে অনিমেষ একাগ্র থাকি আমরা। তাই---

হয়েছে মলিন
চক্ষু এই ; ...পৃথিবীর পথে হেঁটে-হেঁটে
কতোদিন রাত্রি গেছে কেটে!
কতো দেহ এলো,---গেলো,----হাত ছুঁয়ে-ছুঁয়ে
দিয়েছি ফিরায়ে সব; ---সমুদ্রের জলে দেহ ধুয়ে
নক্ষত্রের তলে
ব'সে আছি,----সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া
তুমি কি আসিবে কাছে প্রিয়া!

প্রেমের অনিন্দ্য-সুন্দর প্রকাশ ঘটেনি কি এখানে ? ঘটেছে, তবে তা একজন অস্তিত্ববাদীর প্রেম। প্রেমিকের এখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে বলেই, সে স্ব-নির্বাচনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে বলেই, তার দায়ী হবার এবং দায়িত্বের বোধ আছে বলেই, আছে সেই সাথে মনস্তাপ এবং খেদ, হতাশা এবং যন্ত্রণা।

প্রেমকে জড়িয়ে অস্তিত্ববাদী বোধ 'প্রেম' কবিতাটিতেও রয়েছে। নতুন কোন ব্যতিক্রম নয়---আগের কবিতাগুলোর মতো এখানেও রয়েছে জীবন সম্পর্কে একই বোধ। তবু একটু ভিন্ন মনে হয়, যখন শুনি: 'জীবন হয়েছে এক প্রার্থনার গানের মতন/তুমি আছ ব'লে প্রেম, ----গানের ছন্দের মতো মন/আলো আর অন্ধকারে দুলে ওঠে তুমি আছে ব'লে'। জীবন কি এখানে অস্তিত্ববাদী বোধ থেকে অনেক দূরে গানের ছন্দের মতো, আলো-ঝলমল কোন বলয়ে? হতে পারে তা; তবুও আমরা ভুলব না যে, প্রার্থনার গানের মাঝেও থাকতে পারে মনস্তাপ আর ভয়, এবং বিষাদ। আমরা যথার্থ গাইতে ভালোবাসি: 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু'। অবশ্য ক্ষমার মাঝেও সৌন্দর্য থাকতে পারে ; কিন্তু প্রার্থনার গানের মতো জীবনের শেষে জীবনানন্দ দাশ দেখেন মৃত্যুর ছায়া। তাঁর ভাষায়:

ওগো প্রেম,---বাতাসের মতো যেই দিকে যাও চ'লে
আমারে উড়ায়ে লও আগুনের মতন তখন !
আমি শেষ হব শুধু, ওগো প্রেম, তুমি শেষ হ'লে!

তুমি যদি বেঁচে থাকো,----জেগে র'বো আমি এই পৃথিবীর 'পরে,--
যদিও বুকের 'পরে র'বে মৃত্যু----মৃত্যুর কবর!

প্রার্থনার গানের মতন জীবনকে নিয়ে ভাবতে গিয়েও জীবনানন্দ দাশ মৃত্যুভয় আর উৎকণ্ঠাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারেননি। প্রেমের সাথে তাই প্রয়োজন আরো কিছুর; কবি তাই লেখেন 'স্বপ্নের হাতে'। 'স্বপ্নের হাতে / আমি তাই / আমারে তুলিয়া দিতে চাই'। স্বপ্নের দেশ: আলো ঝলমল, অথবা ধূসর? প্রশ্নোত্তর অনুক্ত রেখেই "ধূসর পাণ্ডুলিপি" পরিক্রমায় ছেদ টানব।

ধরা যাক তাহলে "রূপসী বাংলা"-র কথা। বাংলা বড়ো রূপসী; এই রূপকে নিয়ে নিসর্গ-বন্দনা এখানে কবির উপজীব্য। কিন্তু তবু পাশাপাশি রয়েছে অস্তিত্ববাদী বোধ। রূপসী বাংলা, তোমাকে আমি ছেড়ে যাব না। এখানেও আছে ব্যক্তির স্বাধীন সিদ্ধান্ত, এবং তাঁর দায়িত্ববোধ। 'তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও / আমি এই বাংলার পাড়ে রয়ে যাবো।' ধরা যাক "রূপসী বাংলা"-র প্রথম কবিতাটিকেই।

সেই দিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি
এই নদী নক্ষত্রের তলে
সেদিনো দেখি স্বপ্ন----
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!
আমি চ'লে যাব ব'লে
চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে?
লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে?

কি করুণ মনস্তাপ! আমাদের মনে করিয়ে দেয়: একদিন 'পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে'। অস্তিত্ববাদী খেদ এখানে খোদ অস্তিত্বকে নিয়েই। এমনি আরো আছে: 'আমি যদি ঝ'রে যাই একদিন কার্তিকের নীল কুয়াশায়...'; অথবা, 'ভেবে-ভেবে ব্যথা পাব;—মনে হবে, পৃথিবীর পথে যদি থাকিতাম বেঁচে ...'।

"রূপসী বাংলা"-র নিসর্গপ্রীতির মাঝে যেমন রয়েছে অস্তিত্ববাদী বোধ, তেমনি তা রয়েছে "বনলতা সেন"-এর প্রেমের মাঝেও। 'বনলতা সেন' একটি অনন্য-সুন্দর প্রেমের কবিতা হলেও এ-কবিতায় যে ক্লান্তি-বিষণ্ণতা রয়েছে, রয়েছে উদাস অনুভূতি, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই উদাস-বিষণ্ণতা যে অস্তিত্বেইর 'সব লেনদেন'-এর হিসাব-নিকাশের উৎকণ্ঠা, তা স্বীকার করতেই হবে। তবু উৎকণ্ঠাকে ছাপিয়ে আছে সেখানে প্রেম—'জীবনের ফেনা'।[৭] কিন্তু ধরা যাক 'কুড়ি বছর পরে'-র কথা। আবার যদি তার সাথে দেখা হয়! কে সে? তুমি? 'তখন আবার যদি দেখা হয় তোমার আমার'। এখানে প্রেমের গন্ধ আছে, স্বপ্নের স্বাদ আছে; কিন্তু এ গন্ধ, এ স্বাদ আনন্দ বয়ে আনে কি? কবিতাটির ছত্রে-ছত্রে ছড়িয়ে আছে এর বিপরীত উত্তর। কুড়ি বছর পর দেখা হয় যদি! নিশ্চয়তা নেই, যদি না হয়! যদি মনে না থাকে, তখন: 'কুড়ি বছরের পরে তখন তোমারে নাই মনে'! কুড়ি বছরের যে পরিবর্তন-পরিক্রমা তার অনিশ্চয়তা সীমাহীন; কুড়ি বছর পর কি হবে তখন, কেমন হবে---এই উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে আছে পুরো কবিতাটি জুড়ে। এই উৎকণ্ঠা মনে করিয়ে দেয় যে, জীবন-ভবিষ্যৎ পূর্ব-নির্ধারিত নয়; ইট ইজ হুইচ হি মেক্স্ অব হিমসেল্ফ্।

'হাওয়ার রাত'-কবিতাটির কথা ধরা যাক। 'গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল'। 'সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল [যখন] জেগে উঠেছিলো---আকাশে এক তিল ফাঁক ছিলো না/পৃথিবীর সমস্ত ধূসরপ্রিয় মৃতদের মুখও [যখন] সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি', তখন কি বারবার আমার মনে হয়নি যে, 'আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্ব ভরা প্রাণ'! আর এই সব আয়োজন কি 'মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য?/জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করাবর জন্য?...[এবং যখন] আড়ষ্ট-অভিভূত হয়ে গেছি আমি', তখন কি আমি বলতে পারতাম না যে, 'বিস্ময়ে তাই জাগে মোর গান'? এ হাওয়ার রাত, জীবনানন্দের ভাষায়, 'চমৎকার রাত', 'আশ্চর্য রাত'। কিন্তু কিসের এই অভিভূত-বিস্ময়? এটা কি 'আকাশের সীমানায় কুয়াশায়-কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে ক'রে ...মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য'? যদি তাই হয়, তাহ'লে এই আশ্চর্য-চমৎকার অভিভূত-বিস্ময় জীবনের জয়গানেরই বিস্ময়---যে-বিস্ময় একজন ব্যক্তি

তার জীবন নিজে গড়ে নিয়ে, আত্ম-ব্যক্তিকতা থেকে আন্ত-ব্যক্তিক পর্যায়ে উত্তরণের ভিতর দিয়েই পেতে পারে। এটা আত্ম-ব্যক্তিকতার বোধ তো নয়ই; এশিরিয়া, মিশর এবং বিদিশার মৃত রূপসীরাও যে কাল রাতে কাতারে-কাতারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আর তারই 'প্রবল অত্যাচার [আনন্দ] আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে'। এই আন্ত-ব্যক্তিকতায় উত্তরণের বোধই হলো অস্তিত্ববাদের শেষ কথা।

কিন্তু অস্তিত্ববাদের শেষ কথার আগের-কথা পাওয়া যায় 'হাওয়ার রাত'-এর ঠিক পরের কবিতাটিতেই। 'আমি যদি হতাম'! তুমি আর আমি, আমরা দুজন, রূপালী খই খেত, সোনার ডিমের মতো চাঁদ, ...আর তোমার পাখনায় আমার পালক, আমার পাখনায় তোমার রক্তের স্পন্দন! স্বর্গকে বিনিময়ের জন্য আর কি দরকার? আর কিছুর দরকার হতো না, যদি এই-ই হতো শেষ কথা। কিন্তু এটাতো শেষ কথার আগের, এবং তারও আগের কথা। রূপালী খই-খেতে আমাদের প্রেম নয়, প্রেমের মৃত্যু। গুলির শব্দ, আমাদের পাখায় পিস্টনের উল্লাস, গুলির শব্দ আবার... আমাদের স্তব্ধতা, আমাদের শান্তি। কিন্তু মূল কথা হলো: আজকের জীবনের এই টুকরো টুকরো মৃত্যু, টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা অন্ধকার আর থাকতো না তাহলে। এই টুকরো টুকরো মৃত্যু, আর টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা আর অন্ধকার কি সেই জীবনের কথা মনে করিয়ে দেয় না যে জীবন তিক্ত, উৎকণ্ঠা আর মনস্তাপ যে জীবনকে শিকারীর মতো তাড়া করে ফেরে? অস্তিত্ববাদ এ-জীবনের কথাই বলে: ফড়িঙের, কীটের জীবন এটা নয়: 'যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের----মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা'।[১০] অবশ্য মৃত্যুর ভিতর দিয়ে এ-জীবন থেকে পালিয়ে যাবার কথা অস্তিত্ববাদ বলে না। আমরাও এমনি পালিয়ে যেতে চাইনি। গুলির শব্দ শুনে আমাদের পাখায় জেগেছিল পিস্টনের উল্লাস--- মৃত্যুর ভিতর দিয়ে নয়, মৃত্যু থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে। মৃত্যুকে এড়িয়ে, থেকে যেতে চেয়েছি আমরা উৎকণ্ঠার দেশে। দায়িত্বের যে জীবন, দায়ী হবার, ভয় পাবার, উৎকণ্ঠিত হবার যে জীবন, টুকরো টুকরো মৃত্যুর যে জীবন, অস্তিত্ববাদ তারই কথা বলে, তারই অনুশোচনা ও মনস্তাপ কবি এঁকেছেন এ-কবিতায়।

এই মনস্তাপ আরো প্রকট হয়ে উঠেছে 'অন্ধকার' কবিতায়। অস্তিত্ববাদী বোধের অমশ্রিণ যে দিকটি রয়েছে, তা একটা অতি-কর্কশ রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে এ-কবিতায়। 'সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত' এই পৃথিবী এক পঙ্কিল স্থান; 'ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাস' এখানে দিনের আলোকিত রূপকে নির্ধারিত করে। এখানে যা আছে, তা শুধু আলো নয়, আলো এখানে আক্রান্ত স্পন্দন-সংঘর্ষ-গতি দিয়ে—উদ্যম চিন্তা-কাজ দিয়ে—ভয়াবহ আরতি দিয়ে। স্পন্দন-সংঘর্ষ-গতি আর মূর্খ উচ্ছ্বাস বয়ে মনে আনে এক 'অসীম দুর্নিবার বেদনা'; মন ভরে যায় 'ঘৃণায়-বেদনায়-আক্রোশে'। গভীর অন্ধকার আর ঘুম যেন তাই এক পরম পাওয়া। এ-ঘুম থেকে কোন দিন আর জেগে না ওঠার বাসনা তাই তীব্র।

'অন্ধকার' কবিতার এই সব আরতির মাঝে অস্তিত্ববাদী ভয় আর যন্ত্রণা অতি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। অস্তিত্ববাদী বোধের নিকট ব্যক্তি এখানে যেন পরাজিত, পলায়নমুখী। কিন্তু অস্তিত্ববাদী অবস্থার যে পূর্ণতা, সংঘাত-বেদনা থেকে আত্ম-নির্মাণের ভিতর দিয়ে আন্ত-ব্যক্তিকতায় উত্তরণ, তা আর ঘটেনা এখানে। 'অন্ধকার' কবিতায় অস্তিত্ববাদী বোধ রয়েছে নির্মম সত্যের মতো প্রবল হয়ে, কিন্তু তা রয়েছে এখানে অপরিণত, অপূর্ণ অবস্থায়।

এই বোধ আরো গভীর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে 'সুচেতনা' কবিতাটিতে। জীবন শুধু ক্লান্তি, হতাশা আর মনস্তাপ নয়, এর ভিন্নতর একটা দিকও রয়েছে। স্ব-নির্বাচন এবং আত্ম-নির্মাণের ভিতর দিয়ে আমরা পেঁাছতে পারি সেখানে। সেখানে পেঁাছে আমরা পাব আত্ম-উত্তরণ। সুচেতনাকে তাই আমরা বলতে পারি: 'সুচেতনা.../এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা/ সত্য; তবু শেষ সত্য নয়'/পৃথিবীর এই রক্ত-রূপ, 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ' আমাদের জীবনকে ব্যাহত করে অবাঞ্ছিতভাবে। মানুষকে দিতে চেয়েছি ভালোবাসা, আত্ম-উত্তরণ হবে তাহলে; তবুও তা হলো না। কবির করুণ আকুতি,: 'পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো/ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু/দেখেছি আমার হাতে হয়তো নিহত/ ভাই বোন বন্ধু পরিজন প'ড়ে আছে'। কিন্তু হতাশা, যন্ত্রণা আর মনস্তাপ নয় শুধু, বরং এ-সবকে অতিক্রম করতে চাইব। আত্ম-উত্তরণ হলো না,

কিন্তু হবে; সে পথেই আমরা অগ্রসর হই। আমরা বলি: 'সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে---এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;/সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ'। অস্তিত্ববাদের চরম রূপায়ণ হবে—তারই আশা, তারই স্বীকারোক্তি আমরা পাই এখানে।

"বনলতা সেন"-এর অন্য কবিতাগুলোর কোন-কোনটিতে অস্তিত্ব-বাদী বোধের ছোঁয়া পাওয়া যায়----কোথাও অস্পষ্টভাবে, কোথাও অপ্রবলভাবে। 'হায় চিল', 'শঙ্খমালা', 'নগ্ন নির্জন হাত', 'শিকার', 'শ্যামলী', 'দুজন', 'সবিতা' ইত্যাদি কবিতায় বিরহ-বিষণ্ণতা, ক্ষোভ-যন্ত্রণা, হত্যা ও মৃত্যুকে নিয়ে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ—এসবই ছড়িয়ে আছে ছত্রে ছত্রে।

"বনলতা সেন"-এর পর রয়ে যায় "মহাপৃথিবী" (১৯৪৪), "সাতটি তারার তিমির" (১৯৪৮), "বেলা অবেলা কালবেলা" (১৯৬১) এবং অন্যান্য আরো কিছু কবিতা। জীবনানন্দ-রচনার এই পর্যায়ে জীবনানন্দ দাশের জীবনবোধের অধিকতর পরিণত রূপের সাথে আমরা পরিচিত হই; তাঁর রচনায় আসে প্রাখর্য্য। অস্তিত্ববাদী বোধের যন্ত্রণা-কাতর যে দিকটি রয়েছে, যেখানে উৎকণ্ঠা, মনস্তাপ আর হতাশা পীড়িত করে মানুষকে, সেই দিকের প্রকাশ কবির রচনায় অব্যাহত থাকে; কিন্তু সেই সাথে অস্তিত্ববাদী আত্ম-উত্তরণের বোধ ধ্বনিত হয় অধিক থেকে অধিকতর। অবশ্য এই পরিণত রূপের মাঝে ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি এমনি একটি ব্যতিক্রম। নীচের আলোচনায় এই ব্যতিক্রমটির ওপর এবং অতঃপর আত্ম-উত্তরণের পরিণত দিকটির ওপর কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে।

'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি জীবনসংগ্রামে পরাজিত এক সৈনিকের কাহিনীর মত। ফাল্গুনের রাতের আঁধারে যখন চাঁদ ডুবে গেছে, তখন একগাছা দড়ি হাতে গিয়েছিল সে অশ্বত্থের কাছে; কারণ, মরণের সাধ হয়েছিল তার। 'শোনা গেল লাশকাটা ঘরে/নিয়ে গেছে তারে'। কিন্তু কেন এই আত্ম-হননের অভিশাপ? তার 'বধু শুয়ে ছিলো পাশে----শিশুটিও ছিলো;/প্রেম ছিলো, আশা ছিলো—

জ্যোৎস্নায়,---তবু সে দেখিল/কোন ভূত?' জীবনের পরম কাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলোর অনেক কিছুইতো ছিল তার। অন্যদিকে এই ব্যক্তি 'কোন/ নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই/বিবাহিত জীবনের সাধ/কোথাও রাখেনি কোন খাদ/... হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে/এ-জীবন কোনদিন কেঁপে ওঠে নাই'। যা ছিল না এই ব্যক্তির, তাও তার জন্যে ছিল মঙ্গলেরই বার্তাবহ। থাকতে পারে এতো-সব কিছু, তবুও 'এক বিপন্ন বিস্ময়/আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে/খেলা করে;/আমাদের ক্লান্ত করে,/ক্লান্ত-ক্লান্ত করে'। লাশকাটা ঘরে এই ক্লান্তি নেই বলেই বেছে নিয়েছিল সে আত্ম-হননের পথ। কিন্তু যে বিপন্ন বিস্ময় আমাদের ক্লান্ত-ক্লান্ত করে, তা অতি স্বাভাবিক ভাবেই উৎকণ্ঠা, মনস্তাপ আর হতাশার কারণ হতে পারে। কারণ, বিস্ময়ের বৈশিষ্ট্য এখানে বিপন্নতা। অস্তিত্ববাদী জীবনবোধে বিপন্ন, জীবন-যুদ্ধে পরাজিত একজন ব্যক্তির কথা আমরা শুনি এ-কবিতায়।

'জনান্তিকে' কবিতাটির নামকরণ থেকেই আন্ত-ব্যক্তিকতার একটা আভাস আমরা পাই। অনেক লোকের মিলিত না হলে জনান্তিকে কিছু হতে পারে না। কিন্তু বহু ব্যক্তির বিষয়ে যা দেখতে পাই, তা হলো: 'কোথাও সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ;/বহু দিন থেকে শান্তি নেই'। মনস্তাপ আর হতাশার সুর। পৃথিবীর এই বর্তমান সময়টা এক 'ধৃষ্ট শতাব্দীর' অন্তর্গত। এখানে চারিদিকে অগণন মেশিন ও মেশিনের দেবতার কাছে/নিজেকে স্বাধীন ব'লে মনে ক'রে নিতে গিয়ে তবু/মানুষ এখনো বিশৃঙ্খল'। এখানে মানুষ 'কেবলি আহত হয়ে মৃত হয়ে স্তব্ধ হয়; এ ছাড়া নির্মল কোন জননীতি নেই'। মনস্তাপ আর হতাশার সুরের মাঝেও নির্মল জননীতির অভাববোধ বা পরোক্ষ কামনা আন্ত-ব্যক্তিকতার ভিতর দিয়ে আত্ম-উত্তরণের আকুতিকেই জানায়। এবং এই আকুতি সার্থক হবার আশাবাদও ব্যক্ত করেন কবি একই সাথে। 'অমল কোন রাজনীতি পেতে হলে তবে/উজ্জ্বল সময়স্রোতে চ'লে যেতে হয়'। এই উজ্জ্বল সময়স্রোতের প্রবহমানতা হয়তো প্রীতক্ষার বিষয়, হয়তো আগামী শতাব্দীতে সাধন হবে; এই সময়স্রোত হয়তো 'সকলের তরে নয়', তবু কারো কারো তরে নিশ্চয়ই। উজ্জ্বল সময়স্রোতের অমল রাজনীতির ভিতর দিয়ে জনান্তিকে আত্ম-উত্তরণ---এ যে অস্তিত্ববাদের শেষ কথারই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি।

'সূর্যপ্রতিম' কবিতায়ও দেখি একই ছবি। বালুচর, সূর্যের ঝিলিক, মাছরাঙার ঝিকিমিকি---এ সব ভালোবেসেছিল যারা, তারা 'সময়ের সুবিধায় নিলামে বিকিয়ে গেছে আজ'। তবু এখনো বিকিয়ে যাইনি আমরা যারা, তারা যেতে পারি নব পৃথিবীর দিকে। আমি একা নই----আমরা সকলে আন্ত-ব্যক্তিকতায় যাব সে পথে। কবি বলেন: 'এসো আমরা যে যার কাছে---যে যার যুগের কাছে সব; সত্য হ'য়ে প্রতিভাত হ'য়ে উঠি।/নব পৃথিবীকে পেতে সময় চলেছে?'

'জনান্তিকে' এবং 'সূর্যপ্রতিম'-এর এই বোধ অনিন্দ্য-সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে "বেলা অবেলা কালবেলা" গ্রন্থের 'হে হৃদয়' শীর্ষক অসাধারণ কবিতাটিতে। কবিতাটির দুটো স্তবক এখানে তুলে ধরব। একটি স্তবকে আছে উৎকণ্ঠার কথা:

মৃত সব অরণ্যেরা;
আমার এ-জীবনের মৃত অরণ্যেরা বুঝি বলে:
কেন যাও পৃথিবীর রৌদ্রে কোলাহলে
নিখিল বিষের ভোক্তা নীলকণ্ঠ আকাশের নীচে
কেন চ'লে যেতে চাও মিছে;
কোথাও পাবে না কিছু;
মৃত্যুই অনন্ত শান্তি হয়ে
অন্তহীন অন্ধকারে আছে
লীন সব অরণ্যের কাছে।

আর এই স্তবকটির ঠিক পরেই আছে আশার অপরূপ বাণী:

আমি তবু বলি:
এখন যে-ক'টা-দিন বেঁচে আছি সূর্যে-সূর্যে চলি,
দেখা যাক পৃথিবার ঘাস
সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর
নিষ্পেষিত মনুষ্যতার
আঁধারের থেকে আনে কী ক'রে যে মহা-নীলাকাশ,
ভাবা যাক----ভাবা যাক---
ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি

ভেদ ক'রে শোনা যায় শুশ্রুষার মতো শত-শত
শত জলঝর্ণার ধ্বনি।

উৎকণ্ঠা, মনস্তাপ আর হতাশা থেকে আন্ত-ব্যক্তিকতায় উত্তরণের এই পরিণত মনোভাব "কাব্য সম্ভার"-এ অন্তর্ভুক্ত জীবনানন্দ দাশের অন্যান্য কবিতায়ও রয়েছে প্রবহমান। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় 'লোকেন বোসের জার্নাল', 'মানুষের মৃত্যু হলে', 'যাত্রী', 'সে', এবং এরকম আরো কবিতা। এগুলোতেও আমরা পাই একদিকে উৎকণ্ঠা-মনস্তাপ এবং অন্যদিকে আত্ম-উত্তরণের অমোঘ বাণী।

তিন

কোন বিশেষ তত্ত্বপরিসরে জীবনানন্দ দাশকে সম্পূর্ণভাবে সনাক্ত করা অসম্ভব। এমন কোন ব্যাপ্যমান তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না, যা এককভাবে সমগ্র জীবনানন্দকে চিহ্নিত করতে পারে। অবশ্য জীবনানন্দ দাশকে নানা তত্ত্ব বা মতবাদ দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে এবং হচ্ছে ও হবে। তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে, এ সব চিত্ররূপগুলো সবই আংশিকভাবে সত্য, কোনটাই সামগ্রিকভাবে সত্য নয়।[১১] তবে এও সত্য, শত মত-বৈচিত্র্যের উজ্জ্বল খণ্ডাংশ সমবায়েই চিহ্নিত হবেন কবি জীবনানন্দ দাশ। সেক্ষেত্রে, বলা চলে, জীবনানন্দ দাশের অস্তিত্ববাদী বোধ ও চৈতন্য নিঃসন্দেহে তাঁর বহমান প্রতিভার উজ্জ্বলতর প্রান্ত।

তথ্যনির্দেশ

১ Jean-Paul Sartre, *Existentialism and Humanism*, tr. Philip Mairetd (London : Methuen, 1970), pp. 26-28.

২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২-৩৯

৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

৪ 'Subjectivism', 'subjectivity', ইত্যাদি শব্দগুলো দর্শনের ইতিহাসে সাধারণত ব্যবহৃত হয়ে এসেছে ভাববাদের এবং অধ্যাত্মবাদের পটভূমিতে। এ-শব্দগুলোর বাংলা পরিভাষা যা হয়েছে, স্বভাবতই তা ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী চিন্তা-ধারাকে প্রতিফলিত করে থাকে, এবং সে কারণেই অস্তিত্ব-

বাদের (বিশেষত নাস্তিক অস্তিত্ববাদের) চিন্তাধারাকে প্রতিফলিত করে না। বস্তুত সার্ত 'subjectivity' শব্দটিকে প্রচলিত অর্থের চেয়ে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন (বিস্তৃত আলোচনার জন্যে দেখুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮-২৯ এবং ৪৪-৪৫)। এ কারণে 'subjectivity' শব্দটিকে আমি বাংলায় প্রচলিত পরিভাষা থেকে একটু ভিন্নভাবে প্রকাশ করলাম।

৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

৮ আলোচনায় জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে যেসব উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেগুলো কোন্ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে তা আলোচনার প্রেক্ষাপট থেকেই স্পষ্ট হবে। এর ব্যতিক্রম না হলে উদ্ধৃতিগুলোর জন্যে পৃথকভাবে কোন টীকা দেয়া হবে না। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃত কিছু অতিপরিচিত লাইনের জন্যেও কোন টীকা থাকবে না। আমি এখানে অনুসরণ করেছি, রণেশদাশ গুপ্ত, সম্পাদিত, "জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভার" (ঢাকা : খান ব্রাদার্স, আশ্বিন, ১৩৭৯)

৯ 'জীবনের ফেনা' উপমাটি নেওয়া হয়েছে "বনলতা সেন"-এর 'আমাকে তুমি' কবিতাটি থেকে।

১০ 'আট বছর আগের একদিন', "মহাপৃথিবী"।

১১ দ্রষ্টব্য, 'ভূমিকা', "জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা" (কলিকাতা: ১৯৫৪)।

/